বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

“আমার কাঁধে নবীজীর কদম, সমস্ত অলীর কাঁধে আমার কদম” ।

-হযরত বড়পীর

ছোটদের বড়পীর

হযরত শায়খ সাইয়্যেদ আব্দুল ক্বাদের জীলানী

(রাহমাতুল্লাহি তা’আলা আলাইহি)

রচনায়

মুহাম্মদ মুহিব্বুল্লাহ সিদ্দিকী

সম্পাদনায়

এডভোকেট মোছাহেব উদ্দিন বখতিয়ার

প্রকাশনায়

আন্‌জুমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট

[প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ]

৩২১, দিদার মার্কেট (৩য় তলা দেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম-৪০০০, বাংলাদেশ । ফোন : ০৩১-২৮৫৫৯৭৬,

E-mail:anjumanturst@gmail.com,monthlytarjuman@gmail.com

www.anjumantrust.org

ছোটদের বড়পীর

হযরত শায়খ সাইয়্যেদ আব্দুল ক্বাদের জীলানী

(রাহমাতুল্লাহি তা’আলা আলাইহি)

রচনায়: মুহাম্মদ মুহিব্বুল্লাহ সিদ্দিকী

সম্পাদনায় : এডভোকেট মোছাহেব উদ্দিন বখতিয়ার

প্রকাশকাল

১ রজব, ১৪৩৭ হিজরী

২৬ চৈত্র, ১৪২৩ বাংলা

৯ এপ্রিল, ২০১৬ খৃস্টাব্দ

সর্বস্বত্ব প্রকাশকের

হাদিয়া: ৬০/= (ষাট টাকা)

CHHOTODER BOROPIR HAZRAT SHEIKH SYED ABDUL QUADER JEELANI (Rahmatullahi Ta’ala Alaihi), by Mohammad Mohibbullah Siddiqui, edited by Advocate Musaheb Uddin Baktiar, published by Anjuman-e, Hadiya:Tk 60/= (sixty only).

সূচিপত্র

ক্র. নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.	লেখকের কথা	
২.	উপস্থাপনা	
৩.	পূর্বাভাস	
৪.	যে কারণে বিশ্বে প্রসিদ্ধ	
৫.	খোশ খবর	
৬.	জন্মকাল ও স্থান	
৭.	বংশ পরিচয়	
৮.	পিতা ও মাতার আদব-আখলাক্ব	
৯.	নাম ও উপাধি	
১০.	প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন	
১১.	উচ্চ শিক্ষার জন্য বাগদাদ গমন	
১২.	ডাকাত দল ভক্ত হওয়া	
১৩.	নেযামীয়া মাদরাসায় অধ্যয়ন	
১৪.	চরিত্র	
১৫.	শিক্ষকতা	
১৬.	বিবাহ ও সন্তানাদি	
১৭.	সত্যবাদীতা	
১৮.	মেহমানদারি	
১৯.	ধনী-গরীবদের সাথে আচরণ	
২০.	মতাদর্শ	
২১.	ওয়াজ ও বয়ান	
২২.	বায়'আত গ্রহণ	
২৩.	ইবাদত-বন্দেগী	
২৪.	মাতৃগর্ভে আঠার পারা কোরআন মুখস্থ	
২৫.	গ্রন্থাবলী	
২৬.	যুগের সেরা মুফতী	
২৭.	খাজা মুঈন উদ্দীন চিশতীর বাগদাদ আগমন	
২৮.	কাদেরিয়া তরীকা প্রতিষ্ঠাতা	
২৯.	সমাজ সংস্কার	
৩০.	উপদেশ	
৩১.	ইন্তেকাল	
৩২.	মাযার শরীফ	
৩৩.	কারামত	
৩৪.	বড়পীর নিয়ে গবেষণা	
৩৫.	বাংলাদেশে বড়পীর চর্চা	

লেখকের কথা

আল্লাহ তা'আলার জন্য সকল গুণগান, আর প্রশংসা, যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং যাঁর হাতে আমাদের প্রাণ। দুরুদ ও সালাম আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর, যিনি ছোটদের আদর-সোহাগ করতেন এবং করতে আদেশ দিয়েছেন। আহলে বাইত, পাকপাঞ্জতন, সাহাবায়ে কিরাম এবং সকল ঈমানদার নর-নারীর উপর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক।

প্রিয় কোমলমতি ছোট্ট বন্ধুরা!

আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু, আশা করি সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ তা'আলার দয়া ও করুণায় ভাল আছ। আজ তোমাদেরকে "বড়পীর হযরত শায়খ সাইয়্যেদ আব্দুল ক্বাদের জীলানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি" সম্পর্কে জানাবো। তিনি ছোট-বড় সকলের কাছে অতি পরিচিত। আমাদের সমাজে বিভিন্নভাবে আমরা তাকে স্মরণ করি। তোমরাও পিতা-মাতা, ভাই-বোন, উস্তাদ-সাগরিদ, চাচা-চাচি ইসলামী অনুষ্ঠানে তাঁর নাম শুনেছ। তিনি একজন অতি উচ্চ ও বড় অলি (আল্লাহর বন্ধু)। তিনি ছিলেন। বিশেষত প্রায় সকল মর্যাদার একজন বড় জ্ঞানীও তিনি।

একজন মানুষ তখনই সফল হিসাবে দাবি করতে পারে, যখন তার ইহ জীবন ও পরকাল নিশ্চিত সুন্দর হয়। সফল মানুষ যাঁরা, তাঁরা করতেন আমাদের এ সমাজে বসবাস এবং করেন ও তাঁরা সব সময় মানুষকে ভালোবাসেন এবং তাদেরকে কল্যাণ সফলতার পথে চলার জন্য উপদেশ দেন। আর এ রকম একজন মহান ব্যক্তি হলেন বড়পীর হযরত শায়খ সাইয়্যেদ আব্দুল ক্বাদের জীলানী রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি।

আজও সমাজে বসবাসরত যেসব মানুষের বিপথে চলছে সমাজে অশান্তি সৃষ্টি করছে তারা। হযরত বড়পীর আদর্শ জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে সৎপথে এসে যেতে পারে।

তিনি মানুষের সাথে খুব ভাল আচরণ করতেন। মানুষকে কখনো কষ্ট দিতেন না। খাওয়া-পরা, লেবাছ-পোশাকে তিনি যত্নশীল ছিলেন। তাঁর কাছে কেহ হাদিয়া বা উপহার প্রদান করলে তিনি তা গ্রহণ করতেন। তবে সাথে সাথে তাকেও আরো উত্তম হাদিয়া দিতেন।

হযরত বড়পীর একজন কালজয়ী শ্রেষ্ঠ আলেমও ছিলেন। তিনি বহুকাল আধ্যাত্মিক সাধনা, শিক্ষকতা ও ফাত্ওয়া প্রদান করেছেন। অনেক দূর থেকে ছাত্ররা তাঁর দরসে/ক্লাশে আসত। জ্ঞান চর্চায় তাঁর ছিল নিরলস প্রচেষ্টা। তিনি আপন ঘর-বাড়ি থেকে ৪০০ মাইল দূর বাগদাদে গিয়ে জ্ঞান অর্জন করেছিলেন।

আমাদের মাতৃভূমি বাংলাদেশী হযরত বড়পীর শায়খ আব্দুল ক্বাদের জীলানী রহমাতুল্লাহি আলাইহিকে নিয়ে প্রচুর চর্চা হচ্ছে। তাঁর জীবনী সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বই-পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। আমাদের ছোট ভাই-বোনরা যাতে সহজে বড়পীরকে চিনে ও বুঝো সে জন্যই আমিও 'ছোটদের বড়পীর হযরত সাইয়্যেদ শায়খ আব্দুল ক্বাদের জীলানী রহমতুল্লাহি আলাইহি' দিলাম। বইটি সহজবোধ্য ও সরল ভাষায় লিখার চেষ্টা করেছি।

বিশিষ্ট ইসলামী গবেষক ও সংগঠক জনাব এডভোকেট মোছাহেব উদ্দিন বখতিয়ার সাহেব বইটির আদ্যোপান্ত দেখে আরো সমৃদ্ধ করে দিয়েছেন। আমি তাঁকে এজন্য কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট বইটা প্রকাশ করে সেটার বহুল প্রচারের ব্যবস্থা করেছেন। তাই তাঁদের সকলেরও শোকরিয়া জানাচ্ছি। বিশেষত আমার ছোট ভাই-বোনেরা বইটি পড়ে উপকৃত হলে আমার পরিশ্রম সার্থক হবে বেশি।

মুহিব্বুল্লাহ সিদ্দিকী
মিরপুর, ঢাকা।

ভূমিকা

মহান আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- "আল্লাহর ওলিগণের না আছে ভয়, না আছে অনুশোচনা"। ওলি মানে আল্লাহর প্রিয় ভাজন বা বন্ধু, প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নায়েব বা উত্তরসূরি। সমস্ত ওলি ইসলামের বাণী ও আদর্শ মানুষের কাছে পৌঁছিয়েদিতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। সম্মানিত ওলীগণ প্রথমে নিজের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করেছেন, তারপর জগৎ বাসীকে সঠিক পথে ও মতে আসার জন্য আহ্বান করেছেন। তাঁদের জীবনী ও কর্ম আমাদের জন্য পাথেয় ও আদর্শ।

হযরত বড়পীর সাইয়্যেদ শায়খ আব্দুল ক্বাদের জীলানী রহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বলা হয়, অলিকুল শিরমনি অর্থাৎ আল্লাহর ওলী বা বন্ধুগণের সরদার। বিশ্বে যত ওলী-আওলিয়া এসেছেন এবং আসবেন সকলে হযরত বড়পীর শয়খ আব্দুল ক্বাদের জিলানী রহমতুল্লাহি আলাইহিকে 'বড়পীর' বলে স্বীকার করেছেন ও করেন। বিশ্বে ওলী-আওলিয়া, সূফী, দরবেশ ও বুযূর্গগণের মধ্যে বড়পীরের চর্চা বা স্মরণ হয় সব চেয়ে বেশি। বড়পীর হযরত শায়খ আব্দুল ক্বাদের জীলানী রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি ছিলেন মাদারজাদ ওলী অর্থাৎ মাতৃগর্ভ থেকে ওলী। তাঁর থেকে আমাদের অনেক কিছু শিখার বিষয় রয়েছে। তাঁর জীবনী পুরাপুরিভাবে লিখতে গেলে এক বিরাটাকার গ্রন্থ হয়ে যাবে। তাঁর আদর্শ জীবন অধ্যয়ন করলে আমাদের জ্ঞানের জগৎ আরো বিশাল হবে।

পূর্বাভাস

শুভাগমনের প্রেক্ষাপট

হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম থেকে শুরু করে শেষ নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত প্রত্যেক নবী ও রাসূলের শুভাগমনের যেমন একেকটা প্রেক্ষাপট ও সুফল আছে, তেমনি হযরত বড়পীর রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হির শুভাগমনের ফলে, বিশেষত ইসলামী দুনিয়ায় এক বিরাট পরিবর্তন আসে। তাঁর হাতে ইসলাম পুনর্জীবিত হয়। এ কারণে তাঁর উপাধি হয় মুহি উদ্দীন, অর্থাৎ দ্বীন ইসলামকে পুনর্জীবিতকারী।

মানবজাতির সঠিক পথে রাখার জন্য সময়ে সময়ে আল্লাহ নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মাধ্যমে নবুয়তের দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন। কিন্তু ইসলামকে দেখা-শুনা করার জন্য ওলী-আওলিয়া, আলেম-ওলামা যুগে যুগে আগমন করবেন। নবী পাকের অন্যতম আওলাদ ও ইসলামের প্রসিদ্ধ প্রচারক হলেন হযরত সাইয়্যেদ শায়খ আব্দুল ক্বাদের জীলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। নুবূয়াতের দরজা বন্ধ; কিন্তু বেলায়ত (আল্লাহর বন্ধু হওয়া)-এর দরজা ক্বিয়ামত অবধি খোলা থাকবে।

হযরত আব্দুল ক্বাদের জীলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর শুভ আগমনের প্রাক্কালে পৃথিবীর অবস্থা ছিল শোচনীয়। পৃথিবীতে এক নৈরাজ্যের বিভীষিকায় ছড়িয়ে পড়েছিল। মিশর, বাগদাদ এবং মধ্য এশিয়ার মুসলিম রাজাদের মধ্যে ক্ষমতা বন্টন বিষয়ে হিংসা-বিদ্বেষ দারুণভাবে জমাট বেঁধেছিল। মুসলিম জাহানে যাবতীয় অবিচার-ব্যভিচার বিরাজ করছিলো। তারা ধর্মপ্রচার, সেবা, মায়া-মমতা, দয়া, উন্নয়নমূলক কাজের বিষয়ে উদাসীন ছিল।

মুসলিম নামধারী পথহারা সম্প্রদায় মাথা চাড়া দিতে শুরু করল। খারেজী, শিয়া, রাফেযী, জবরিয়া, ইমামিয়া, মু'তাযিলা ফিরকার লোকেরা শান্তির ধর্ম ইসলামকে ভিন্নভাবে উপস্থাপন করতে আরম্ভ করল।

মুসলমানের ঘরে জন্ম নিয়েও মুসলমান হিসেবে ধর্ম পালন পরিপূর্ণভাবে করছে না। নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, পর্দা, পিতা-মাতার খেদমত, অন্যের অধিকার সহ এ সমস্ত বিষয়ে মুসলমানগণ শতভাগ মনযোগী ছিল না।

যে কারণে বিশ্বে প্রসিদ্ধ

অনেকগুলো সঙ্গত কারণে বড়পীর হযরত সাইয়্যেদ শায়খ আব্দুল ক্বাদের জীলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আমাদের কাছে প্রসিদ্ধ। তিনি সারা জীবন মানুষের জন্য কাজ করেছেন। গরীব-দরিদ্র লোকজনের প্রতি খুব স্নেশীল ছিলেন। দিনে ও রাতে আল্লাহ্‌র বিধি-নিষেধ যথাযথভাবে পালন করতেন। যে ব্যক্তি তার সর্বসত্তা মহান আল্লাহ তা'আলার জন্য বিলিয়ে দেয়, তার সব বিষয়ের প্রয়োজন আল্লাহ নিজেই মেটান। হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে- "আল্লাহ্ যাকে চান দ্বীনের গভীর জ্ঞান দান করেন"। জনৈক ইসলামী মনীষী বলেছেন, "যে আল্লাহর হয়ে যায়, দুনিয়া তার হয়ে যায়।" দুনিয়াতে কত মানুষ এসেছে আবার

চলে গেছে। আমরা সকলকে কি তাদেরকে মনে রেখেছি? যে ব্যক্তি নিজ কর্মের মাধ্যমে প্রতিপালককে খুশি করেছেন কেবল তাঁরাই সর্বদা অমর হয়ে থাকেন। অনুরূপ গাউসুল আযম হযরত আব্দুল ক্বাদের জীলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি স্রষ্টার ইবাদত, তাঁর রাসূলের অনুসরণ ও সৃষ্টির সেবা করার কারণে আজও অমর ও স্মরণীয়, অনুরণীয়।

খোশ খবর

যাঁরা আল্লাহ পাকের অতি প্রিয় তাঁদের অনেকের আগমন ও প্রস্থান সম্পর্কে তাঁদের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বড়পীর হযরত আব্দুল ক্বাদের জীলানী নবী বংশের সন্তান। তাঁর শুভ জন্ম সম্পর্কেও স্বয়ং প্রিয় নবী থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

একবার প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি বৃক্ষের নিচে বসে আপন দৌহিত্রদ্বয় তথা হযরত হাসান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ও হযরত হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর সাথে খোশগল্প করছেন। নবীজী এক পর্যায়ে ছোট নাতি হযরত হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে বললেন, প্রিয় হুসাইন! আমার অবর্তমানে কেউ যদি তোমার সাথে শত্রুতা পোষণ করে অথবা তোমাকে কষ্টে ফেলে কিংবা নিজ স্বার্থে তোমার বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করে, তাহলে তুমি কি করবে?" উত্তরে ইমাম হুসাইন বললেন- নানা জান, এরূপ যদি কেউ আমার সাথে করলে আমি তাকে প্রথম ও দ্বিতীয় বার ক্ষমা করবো। তৃতীয় বার আমার হাত থেকে তার রক্ষা হবে না।" নবীজী হযরত হুসাইনের উত্তর শুনে খুশি হলেন; আনন্দে তাঁর চোখে পানি এসে গেল। নবীজী বললেন, "তোমার মাধ্যমেই আমার বংশ টিকে থাকবে ক্বেয়ামত পর্যন্ত, ইমাম মাহদী (আলাইহিস সালাম) তোমারই বংশে আসবে।

এবার নবীজী বড় নাতি হযরত ইমাম হাসান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে বললেন, "আমার অবর্তমানে তোমার উপর যদি কেউ অকারণে কষ্ট দেয়, তোমাকে দুঃখ দেয় অথবা তোমার অনিষ্ট করার চেষ্টা করে, তবে তুমি তার সাথে কিরূপ ব্যবহার করবে?" হযরত হাসান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, "হে নানাজান! আমি আমার শত্রু আমার প্রতি অন্যায় আচরণকারী লোকদের সাথে সুন্দর ও উত্তম আচরণ করবো। চেষ্টা করবো সঠিক পথে আনার জন্য। আর যারা আমার সাথে প্রতিহিংসা, প্রতিশোধমূলক আচরণ করবে, আমি তাদের ধারে কাছেও অবস্থান করবো না। প্রিয় নবীজী খুশি হলেন এবং বললেন, "মহান আল্লাহ তোমার প্রতি রাজি হয়ে এক মহা মূল্যবান উপহার (সন্তান) তোমাকে দেবেন।

যে আল্লাহ ও তাঁর বান্দার মধ্যে সেতু তৈরি করবে, মানুষকে আলোর পথ দেখাবে, সমস্ত কুসংস্কার দূর করবে।" কার্যত: তিনিই হলেন ওলীকুল শ্রেষ্ঠ আওলাদে রাসূল হযরত সাইয়্যেদ শায়খ আব্দুল ক্বাদের জীলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

একদা হযরত হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন ছিলেন। তিনি মোরাকাবা (ধ্যান) করে দেখতে পেলেন আরশের নিকটে এক আলো প্রজ্জলিত, আর এ আলোতে সকল ফেরেশতা আল্লাহর ইবাদতে লিপ্ত রয়েছেন। এ আলোকে হযরত হাসান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) জিজ্ঞাসা করলেন- কে তুমি? এখানে কেন আলো দান করছো? আলো থেকে আওয়াজ আসলো হে আওলাদে রাসূল! আমরা আল্লাহ্‌র তাসবিহ পাঠ করছি, আপনাকে একটি শুভ সংবাদ দিচ্ছি, আপনার ছোট ভাই হুসাইনের বংশে ৯ জন ইমাম আসবেন আর আপনার বংশে আল্লাহর একজন বিশিষ্ট বন্ধু আসবেন। একথা শুনে ইমাম হাসান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) খুব খুশি হলেন এবং আবার আল্লাহর ইবাদতে মনোনিবেশ করলেন।

জন্মকাল ও স্থান

হযরত গাউসুল আযম আব্দুল ক্বাদের জীলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ১লা রমযান, ৪৭০ হিজরী মোতাবেক ১০৭৭ ঈসায়ী সনে পারস্যের জীলান বা গীলান শহরে জন্মগ্রহণ করেন, যা বর্তমান ইরাকে অবস্থিত।

বড়পীরের মাতা উম্মুল খায়ের ফাতেমা রাহমাতুল্লাহি আলাইহা-এর বয়স ৬০ বছর, তখনই হয়ত বড়পীর মাতৃগর্ভে এসেছিলেন।

বংশ পরিচয়

বড়পীর হযরত আব্দুল ক্বাদের জীলানী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি আমাদের প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং শেরে খোদা হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর পবিত্র বংশে পৃথিবীতে আগমন করেছেন। দুই দিক থেকে তিনি আওলাদে রাসূল বা নবী করীমের বংশধর। পিতার দিক থেকে হাসানী অর্থাৎ ইমাম হাসান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) সাথে বংশ মিলিত হয়েছে। অন্য

দিকে মাতার দিক থেকে হুসাইনী অর্থাৎ ইমাম হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর বংশের সাথে মিলিত হয়েছে।

পিতার দিক থেকে তাঁর বংশধারা

১. হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)
২. হযরত আলী (রাদ্বিঢাল্লাহু আনহু)
৩. হযরত সাইয়্যেদ ইমাম হাসান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)
৪. হযরত সাইয়্যেদ হাসান মুসান্না (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)
৫. হযরত সাইয়্যেদ আব্দুল্লাহ মাহ্‌য (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)
৬. হযরত সাইয়্যেদ মূসা আলজওন (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)
৭. হযরত সাইয়্যেদ আব্দুল্লাহ সালেহ (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)
৮. হযরত সাইয়্যেদ মূসা সানী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)
৯. হযরত সাইয়্যেদ আবূ বকর দাঊদ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)
১০. হযরত সাইয়্যেদ শামসুদ্দীন যাকারিয়া (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)
১১. হযরত সাইয়্যেদ ইয়াহহিয়া যাহিদ (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)
১২. হযরত সাইয়্যেদ আব্দুল্লাহ জিবিল্লী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)
১৩. হযরত সাইয়্যেদ আবূ সালেহ মূসা জঙ্গীদোস্ত (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)
১৪. হযরত সাইয়্যেদ আব্দুল ক্বাদের জীলানী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)

মায়ের দিক থেকে বংশধারা

১. হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)
২. সাইয়্যেদুনা ফাতিমাতুয্ যাহরা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)
৩. সাইয়্যেদ ইমাম হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)
৪. সাইয়্যেদ ইমাম যয়নুল আবেদীন (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)
৫. সাইয়্যেদ ইমাম বাক্বের (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)
৬. সাইয়্যেদ ইমাম জাফর সাদিক্ব (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)
৭. সাইয়্যেদ ইমাম মূসা কাযিম (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)
৮. সাইয়্যেদ ইমাম আলী রেযা (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)
৯. সাইয়্যেদ আবূ আলাউদ্দীন (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)
১০. সাইয়্যেদ কামাল উদ্দীন ঈসা (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)
১১. সাইয়্যেদ আবুল 'আত্বা আব্দুল্লাহ (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)

১২. সাইয়্যেদ মাহমুদ (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)
১৩. সাইয়্যেদ মুহাম্মদ (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)
১৪. সাইয়্যেদ আবূ জামাল (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)
১৫. সাইয়্যেদ আব্দুল্লাহ সাউমায়ী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)
১৬. সাইয়্যেদা উম্মুল খায়ের আমাতুল জব্বার ফাতিমা (রহমাতুল্লাহি আলাইহা)
১৭. হযরত সাইয়্যেদ আব্দুল ক্বাদের জীলানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)

পিতা ও মাতার আদব-আখলাক্ব

আমরা প্রায় বলতে শুনি- "মা ভাল যার মেয়ে ভাল তার, বাপ ভাল যার ছেলে ভাল তার"। তবে সার কথা হলো- সাধারণত পিতা-মামা ভাল হলে সন্তানও ভাল হয়।

হযরত সাইয়্যেদ আবূ সালেহ মুসা জঙ্গীদোস্ত (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) ছিলেন হযরত বড়পীরের পিতা। তিনি ইসলামের বিধি-বিধান কায়েমের জন্য সর্বদা প্রচেষ্টা চালাতেন এবং প্রয়োজনে কাফিরদের জিহাদ করতেন অথবা এজন্য তৈরি থাকতেন। যার কারণে তিনি জঙ্গীদোস্ত বা "যুদ্ধ প্রিয়" উপাধি লাভ করেন। তাছাড়া বর্ণিত আছে যে, একদা তিনি এক কঠোর সাধনায় সাফল্য লাভ করেছিলেন। তখন তাঁকে হযরত খাদ্বির আলায়হিস্ সালাম এসে তাঁকে এ উপাধিতে ভূষিত করেন।

সাইয়্যেদা উম্মুল খায়ের আমাতুল জব্বার ফাতিমা (রাহমাতুল্লাহি আলাইহা) ছিলেন তাঁর মাতা। তিনি ছিলেন একজন উঁচু স্তরের আবিদা, সালেহা মহিলা। তার পিতা ছিলেন যুগ শ্রেষ্ঠ অলি, সাইয়্যেদ আব্দুল্লাহ সাউমা'ঈ (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)।

হযরত আবূ সালেহ মূসা একজন কঠোর সাধনাকারী বুযুর্গ ছিলেন। একদিন তিনি নদীর তীর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। কিছু দূর অতিক্রম করার পর তিনি ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম নিতে লাগলেন। তাঁর ক্ষুধাও হয়েছিলো তীব্রভাবে। তিনি দেখলেন একটি ফল (আপেল) পানিতে ভাসছে। তিনি ফলটি পানি থেকে তুলে নিলেন এবং আহার করলেন। আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন। তাঁর মাথায় হঠাৎ

চিন্তা আসলো, যে 'আমি কার ফল খেলাম? এর মালিক কে? কোথা থেকে তা এসেছে? ফলের মালিকের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে!'

তিনি যেদিক থেকে ফলটি ভেসে এসেছে অর্থাৎ উজানের দিকে রওনা হলেন। অনেক দূর পথচলার পর তিনি দেখলেন নদীর ধারে একটি আপেল বাগান এবং তাতে অনেক পাকা ফল। তিনি নিশ্চিত হলেন, এখান থেকেই ফলটি নদীতে পড়ে ভেসে গিয়েছিল। লোকদের মাধ্যমে জানতে পারলেন এ বাগানের মালিক সাইয়্যেদ আব্দুল্লাহ সাউমা'ঈ। তিনি একজন ধর্মপরায়ণ ইবাদতকারী বুযুর্গ।

হযরত বড়পীরের বাবা সাইয়্যেদ আব্দুল্লাহ সাউমা'ঈর সামনে গিয়ে তাঁর আসার কারণ জানালেন এবং ফলটি আহারে জন্য ক্ষমা চাইলেন কিংবা বিনিময় দিতে চাইলেন। হযরত আবদুল্লাহ্ সাউমা'ঈ হযরত আবূ সালেহ-এর দিকে তাকালেন। আর ভাবলেন যার মধ্যে একটি ফল খাওয়ার কারণে অপরাধ বোধ হয় এবং এত দূর থেকে সে তজ্জন্য ক্ষমা চাইতে আসে, সে নিশ্চয় অসাধারণ মানুষ। সুতরাং তিনি বললেন ক্ষমা করতে পারি, তবে এক শর্তে। তোমাকে আমার বাড়ীতে ১২ বছর কাজ করতে হবে। হযরত আবূ সালেহ বললেন, "আমি রাজি।" কারণ তিনি তো দুনিয়ার কষ্টের বিনিময়ে পরকালের শান্তি চান। সাইয়্যেদ আব্দুল্লাহ সাউমা'ঈ হযরত আবূ সালেহকে নিজের কাছে রেখে শরীয়ত ও তরীক্বত এর শিক্ষা ও দীক্ষা দিতে লাগলেন। এক পর্যায়ে নানা বিষয়ে শিক্ষা দান করলেন। আল্লাহর নৈকট্যধন্য বান্দায় পরিণত করে নিলেন। এভাবে দীর্ঘ ১২ বছর কেটে গেলো। একদিন হযরত আবূ সালেহ বললেন- "হুজুর, আপনার কথা মত আমি ১২ বছর পার করেছি, আমাকে ক্ষমা করলেন তো?" সাইয়্যেদ আব্দুল্লাহ সাউমা'ঈ বললেন, শুন, আমার আরো একটি কথা আছে, তাহলো আমার ঘরে একটি বিবাহের উপযুক্ত কন্যা রয়েছে। তুমি তাকে বিবাহ করলে ক্ষমা পেতে পারো। শুন, আমার মেয়েটি বোবা, অন্ধ, খঞ্জ। হযরত আবূ সালেহ তাতেও রাজি হয়ে গেলেন। যদি এর মাধ্যমে হাশরের ময়দানে দায়মুক্ত অবস্থায় ওঠা যায়।

ইসলামী পদ্ধতিতে বিবাহ অনুষ্ঠিত হল। স্ত্রীকে প্রথম দেখায় হযরত আবূ সালেহ বিচলিত হয়ে গেলেন। কারণ তিনি দেখতে পেলেন তাঁর সামনে একজন সুন্দরী-রূপসী রমণী বসা। তিনি অমনি ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন। ঘরের দরজায় শ্বশুর দাঁড়ানো। বড়পীরের পিতা হযরত আবূ সালেহ বললেন, হুযূর! আপনি বলেছেন- আপনার মেয়ে বোবা, অন্ধ, খঞ্জ; কিন্তু সে সম্পূর্ণ বিপরীত। সাইয়্যেদ

আব্দুল্লাহ সাউমা'ঈ বললেন, আমি যা বলেছি সবই ঠিক। আমার মেয়ে অন্ধ, কারণ সে কোন পরপুরুষ দেখেনি। আমার মেয়ে বোবা কারণ, তাঁর মা এবং আমাকে ব্যতীত অন্য বেগানা পুরুষের সাথে কথা বলেনি। সে খোড়া কারণ সে কখনো গুনার দিকে নিজের কদম ব্যবহার করে যায়নি। যাও সে তোমারই স্ত্রী। আর শ্বশুর সাইয়্যেদ আব্দুল্লাহ সাউমা'ঈ নিজ জামাতা ও মেয়ে কে নিয়ে আল্লাহর দরবারে দোআ করলেন, ''হে আল্লাহ! তুমি তাদেরকে সুখি করো এবং তাদেরকে নেক সন্তান দান করো।''

হযরত আবূ সালেহ আপন শ্বশুর থেকে স্ত্রীর গুণাবলী শুনে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন। কারণ, তিনি সত্যের সন্ধানে বের হয়ে আল্লাহর এসব রহমত দ্বারা ধন্য হলেন!

নাম ও উপাধি

সাধারণত সমাজে একজন মানুষকে একাধিক নামেও ডাকা হয়। মা এক নামে ডাকেন, বাবা এক নামে ডাকেন, দাদা আরেক নামে ডাকেন। 'বড়পীর' ও হযরত শায়খ আবদুল ক্বাদির রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হির একটি উপাধি। সন্তান-সন্ততির একটি সুন্দর নাম রাখা প্রত্যেক পিতা-মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য। নাম রাখার ক্ষেত্রে নামের অর্থের দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। বড়পীরের পিতা আবূ সালেহ রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি ছেলের নাম রাখেন, 'আবদুল ক্বাদির।' এটা বড়পীরের মূল নাম। এর অর্থ মহা শক্তিশালী বান্দা। নামও রাখলেন শরীয়ত সম্মত পন্থায়; আনন্দঘন পরিবেশে।

বড়পীর সাইয়্যেদ হযরত আব্দুল ক্বাদের তাঁর জন্মস্থান 'জীলান' শহরের দিকে সম্পৃক্ত করে গীলানীও বলা হয়। তাঁর বেলায়তের পরিধি আল্লাহর সৃষ্টি জুড়ে। যার কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে তিনি বিভিন্ন উপাধিতে বা নামে পরিচিত। কয়েকটি উপাধি উল্লেখ করা হলো: 'গাউসুল আযম', 'মাহবুবে সোবহানী', 'গাউসে পাক', 'ক্বুত্বে রাব্বানী', 'গাউসে সামদানী', মাশুকে হাক্কানী, নূরে রহমানী, শাইখুল মাশায়েখ, সাইয়্যেদুল আওলিয়া, পীরে পীরান, মীরে মীরান, ইমামুত্ব ত্বরীক্বত, মহিউদ্দীন, গাউসুস সাক্বালাঈন, ইমামুল আউলিয়া, নূরে ইয়াযদানী, হাসানী, হুসাইনী ইত্যাদি।

প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন

শৈশবকালে পিতা ও মাতার কাছে হযরত আব্দুল ক্বাদের জীলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। তারপর জীলান শহরের স্থানীয় মক্তবেও তিনি গিয়েছিলেন।

মক্তবের উস্তাদজি গাউসে পাক কে প্রাথমিক স্তরের ছাত্র মনে করে প্রথমে 'আ'ঊযুবিল্লাহ্ ও বিসমিল্লাহ'-এর সবক দিলেন; কিন্তু আর্শ্চযের বিষয় হলো- হযরত গাউসে পাক আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পাঠ করে আলিফ-লাম-মীম থেকে শুরু করে একটানা ১৮ পারা পর্যন্ত মুখস্থ শুনিয়ে দিলেন। উস্তাদজি অবাক হয়ে গেলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলে শিশু আবদুল ক্বাদির বললেন, আমার মহীয়সী আম্মাজান আঠার পারার হাফেজ ছিলেন। তিনি তা বারংবার তিলাওয়াত

করতেন। তাঁর থেকে শুনে শুনে আমি তাঁর গর্ভাশয়েই তা হেফয্ করে ফেলেছি। এটা ওলীর কারামত। ওলীর কারামত সত্য।

উচ্চ শিক্ষার জন্য বাগদাদ গমন

পবিত্র ক্বোরআনে ইরশাদ হয়েছে- "যারা জানে, আর যারা জানে না, তারা কি এক রকম?"। অর্থাৎ এক সমান নয়। আমাদের নবীজী বলেন, "জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক নর-নারীর উপর ফরজ।" তিনি আরো বলেন, "জ্ঞানীর কলমের কালি শহীদের রক্তের চেয়েও পবিত্র"। শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড। যে জাতি যত শিক্ষিত সে জাতি তত উন্নত। এ দুনিয়াতে যারা আজ বিভিন্ন দিক দিয়ে বিখ্যাত, তাঁরা সকলেই জ্ঞান চর্চা করেছেন সবার আগে।

বাল্য কালেই গাউসে পাকের পিতা ইনতিকালের কারণ। ছেলের উচ্চ শিক্ষার জন্য ৪০টি দীনার/দেরহাম রেখে যান। পিতার ইনতিকালের পর বড়পীর কিছু দিন পারিবারিক কাজকর্ম শুরু করেন। পরে জ্ঞানের প্রতি তাঁর মধ্যে প্রবল আগ্রহের সৃষ্টি হয়। সুতরাং তিনি উচ্চশিক্ষা অর্জনের জন্য বাগদাদ যাওয়ার ইচ্ছা করেন। মহীয়সী মা তাঁকে অনুমতি প্রদান করেন এবং তাঁর জন্য দো'আ করলেন।

তখন বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার অন্যতম ও প্রসিদ্ধ কেন্দ্র ছিল বাগদাদ। গাউসুল আ'যম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি উচ্চতর জ্ঞান অর্জনের জন্য মায়ের দো'আ নিয়ে বাগদাদে চলে যান এবং সেখানে দীর্ঘ দিন অবস্থান করেন। তিনি যখন বাগদাদে যাচ্ছেন, তখন তাঁর বয়স ১৮ বছর আর মায়ের বয়স ৭৮ বছর।

ডাকাত দলের হিদায়ত লাভ

জীলান শহর থেকে বহু দূরে বাগদাদ নগরী। সাধারণত ব্যবসার উদ্দেশ্যে জীলান থেকে মাঝে-মধ্যে কাফেলা বা দলবদ্ধ হয়ে ব্যবসায়ীরা বাগদাদে যেতেন। সমস্ত পথ পায়ে হেঁটে যেতে হতো। রাস্তায় আবার ডাকাতিও হয়; অনেক সমস্যা। বড়পীরের মাতা ছেলের বগলে ৪০টি দীনার সেলাই করে দিয়ে বললেন, হয়তো জীবনে তোমার সাথে আমার আর সাক্ষাত হবে না। আল্লাহর ক্বুদরতের হাতে তোমাকে ছেড়ে দিলাম। আমার উপদেশগুলো মনে রেখ, "বাবা, কোন দিন কোন সময় মিথ্যা কথা বলবে না; সব সময় সত্য কথা বলবে।" একান্ত বিপদের সময় পড়ার জন্য দো'আ শিখিয়ে দিলেন এবং অনেক উপদেশ দিলেন।

ব্যবসায়ীদের সাথে পথ চলতে শুরু করলেন। কয়েক দিন চলার পথে দিনের পর রাত এলো। গভীর রাতে একদল ডাকাত এসে কাফেলার উপর হামলা করলো এবং অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে ব্যবসায়ীদের মালামাল লুট করতে লাগল।

হঠাৎ সামনে ৬০ সদস্য বিশিষ্ট ডাকাতের দল। ডাকাতদল কাফেলার সকলের টাকা-পয়সা, ধন-সম্পদ, পণ্য-সম্ভার সব কিছু লুণ্ঠণ করল। তখন হযরত বড়পীর দো'আ পড়তে থাকেন।

প্রথমে বড়পীর এর কাছে কোন ডাকাত আসল না। মনে করেছে এ ছোট্ট বালকের কাছে কি বা আর থাকবে! পরিশেষে একজন বড়পীরের কাছে কিছু আছে কি না জিজ্ঞাসা করলো। বড়পীর বললেন, "হ্যাঁ, আছে। আমার বগলের নিচে জামাতে সেলাই করা চল্লিশ দীনার আছে।" ডাকাত মনে করল বাচ্চাটি কৌতুক করছে, সে চলে গেল। আবার আরেক জন ডাকাত আসলো, সেও কৌতুক মনে করে চলে গেল।

ডাকাতদের মধ্যে মালামাল বন্টন হচ্ছে। এক ডাকাত বড়পীরের কথা উল্লেখ করল। ডাকাত সরদার বলল, "তাকে নিয়ে আস।" এক ডাকাত বড়পীরকে সরদারের সামনে উপস্থিত করল। সরদার বলল, "কোথায় তোমার দিনার?" বড়পীর বললেন, "আমার বগলের নিচে।" বগলের নিচে দিরহামগুলোর সন্ধ্যান পেলো। তাকাত সর্দার বলল, "তোমাকে কে সত্য বলা শিখিয়েছে, এ করুণ সময়েও?" বড়পীর তাঁর মায়ের কথা বললেন।

বড়পীর আরো বললেন, "জান্নাত মায়ের পায়ের নিচে।" সত্য বলার জন্য আমার মা আমাকে উপদেশ দিয়েছেন। মিথ্যা বলা মহাপাপ।" এসব কথা শুনে ডাকাত সর্দারের মন গলতে শুরু করল। সে ভাবল এ ছোট বালক তাঁর মায়ের কথা মত সত্যের উপর অটুট থাকছে, আর আমি বেচারা তো জীবনে বেশী সময় মিথ্যা, জোর-ঝুলম ও মানুষের হক বিনষ্টের মধ্যে অতিবাহিত করে দিয়েছি। তখন সে গাউসে পাকের হাতে তাওবা করে নেক্কার, খোদাভীরু হয়ে গেলো। সে তার সাথীদেরও সঠিক পথে তথা ইসলামের পথে, আলোর পথে, শান্তির পথে আসার জন্য আহ্বান জানাল। সকলের মন গলে গেল। সকলে লুণ্ঠণকৃত মালামাল ফেরত দিয়ে দিল। হযরত বড়পীরের নিকট তাওবা করল এবং বাকী জীবনটুকু আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পথে অতিবাহিত করলো। এ ডাকাত ছিলো হযরত বড়পীরের হাতে প্রথম হিদায়ত প্রাপ্ত মানুষ।

নেযামীয়া মাদরাসায় অধ্যয়ন

বড়পীর সাইয়্যেদ হযরত আব্দুল ক্বাদের জীলানী বাগদাদে যাওয়ার পর বিশ্ব বিখ্যাত 'নেযামিয়া মাদ্‌রাসায়' ভর্তি হন। তিনি নিজেই বলেন, "আমি ইলমে দ্বীন হাসিল করতে করতে ক্বুত্বব হয়ে গিয়েছি।" ক্বুত্বব বেলায়তের একটি উঁচুতর সোপান। দীর্ঘ কয়েক বছর কঠোর পরিশ্রম করে তাফসীর, হাদিস, ফিকহ, তাসাউফ, আরবি সাহিত্য ছাড়াও তিনি বিজ্ঞান, দর্শন, ভূগোল ও ইতিহাস ইত্যাদি শাস্ত্রে বিশদ জ্ঞান অর্জন করেন।

তিনি কালের সেরা বড় বড় উস্তাদের নিকট পড়াশুনার সুযোগ পেয়েছিলেন। আর অসাধারণ মেধা, জানান্বেষণের প্রবল ইচ্ছা ও আদব-আখলাক্বে উন্নত হওয়ার কারণে সকল শিক্ষকগণও তাঁর প্রতি যত্নবান হন। মাদ্‌রাসার অন্যতম উস্তাদ হযরত আবূ সাঈদ মাখযূমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বড়পীরকে বেশি আদর করতেন ও ভালবাসতেন। তিনি বলেন, "হে আব্দুল কাদের; শীঘ্রই বিশ্বের মানুষ তোমার দিকে ঝুঁকে পড়বে এবং তোমার মাধ্যমে দুনিয়া ও আখেরাতে উপকৃত হবে।" কারণ, তিনি নিজেও এক মহান ছিলেন। ওলী ওলীকে সহজেই চিনেন।

চরিত্র

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "নিশ্চয় আপনি উত্তম চরিত্রের অধিকারী"। প্রিয় নবী বলেন, "তোমাদের মধ্যে ওই ব্যক্তি উত্তম, যার চরিত্র ভাল"। জনৈক পন্ডিত বলেন, "টাকা হারিয়ে গেছে; কিছুই হারায়নি, স্বাস্থ্য হারিয়ে গেছে; কিছু হারিয়েছে, কিন্তু চরিত্র হারিয়ে গেছে; সব হারিয়ে গেছে"। চরিত্র একজন মানুষকে মানুষ হিসাবে প্রমাণিত করে। একটি প্রবাদ বাক্য আছে- "চরিত্রহীন ব্যক্তি পশুর সমান।" একজন মানুষ ভাল বা উত্তম মানুষ হতে হলে যেসব গুণের দরকার; হযরত বড়পীর আব্দুল ক্বাদের জীলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর মধ্যে ওই সকল গুণের সমাহার ছিল। তাঁর সত্যবাদিতা, ধৈর্য, সংযম, ভদ্রতা, মমতা, স্নেহ, সদাচরণ, নম্রতা, সাহসিকতা, দানশীলতা, উদারতা, মেহমানদারী ও দয়া-মায়া বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায়। হুযূর গাউসে পাকের অন্যতম

চরিত্রের মধ্যে একটি হলো আত্মত্যাগ। কারণ কথায় আছে "ভোগে সুখ নেই; ত্যাগই প্রকৃত সুখ।" একবার বাগদাদে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। অধিকাংশ মানুষ না খেয়ে দিন কাটাচ্ছে। গাউসে পাক খাদ্যের সন্ধানে নদীর তীরে আসছেন, তিনি পথে দেখতে পেলেন তাঁর পূর্বে আরো অনেক মানুষ এসে বসে আছে। অত:পর তিনি ফিরে গেলেন। তিনি মানুষকে খাওয়াতে বেশী পছন্দ করতেন।

শিক্ষকতা

শিক্ষকের মর্যাদা অনেক। একজন শিক্ষক একটি জাতিকে আলোকিত করতে পারেন। শিক্ষক তথা জ্ঞানী ব্যক্তিদের সম্মান করা সকলের উপর দায়িত্ব ও কর্তব্য। যদিও আমাদের সমাজে নানাভাবে শিক্ষক সমাজকে অবহেলা করার সংবাদ পাওয়া যায়, যা কোন দিন কাম্য নয়। একজন শিক্ষক একটি আলো। আলো থেকে একাধিক আলো জ্বালানো হলে আলো শেষ হয় না। শিক্ষক একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন জাতিকে আলোকিত করেন।

প্রিয় বন্ধুরা! আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে ওই ব্যক্তি উত্তম, যে নিজে ক্বোরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়।"

শিক্ষা গ্রহণ করে আবার শিক্ষাদান করা অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাজ। আর ছাত্রজীবন থেকে হযরত বড়পীরের জ্ঞানের জগৎ সম্পর্কে নেযামিয়া মাদ্‌রাসার অধ্যাপক হযরত আবূ সাঈদ মাখযূমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি'র ভালধারণা ছিল।

প্রতিষ্ঠানিক পড়া-লেখা শেষ করার পর হযরত বড়পীর সাইয়্যেদ আব্দুল ক্বাদের জীলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর অন্যতম উস্তাদ নেযামিয়া মাদরাসার অধ্যাপক হযরত আবূ সাঈদ মাখযূমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি'র নিজ হাতে গড়া মাদরাসা "বাবুল আ'জাজ"-এর শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্ত হন। অল্প সময়ের মধ্যেই মাদরাসার জন্য একটি সুন্দর ইতিহাস সৃষ্টি করতে তিনি সক্ষম হন। আর অল্পদিনের মধ্যে তিনি একই মাদরাসার প্রধান হিসেবে দায়িত্ব প্রাপ্ত হন।

বড়পীর বহুমুখী প্রতীভার অধিকারী ছিলেন। তিনি হাদীস, ধর্মতত্ত্ব, ব্যাকরণ, ন্যায়বিদ্যা, তাফসীর, তাওহীদ, ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা দিতেন।

মাদ্‌রাসায় অনেক দূর থেকে ছাত্ররা এসে ভর্তি হত; ছাত্র সংখ্যা অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাওয়ায় মাদ্‌রাসা সম্প্রসারণ করতে লাগল।

বিবাহ ও সন্তানাদি

ইবাদত-বন্দেগীতে ব্যাঘাত ঘটার আশংকায় গাউসে পাক সংসার জীবনে জড়াতে চাননি। কিন্তু রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্বপ্ন যোগে তাঁকে বিবাহ করার নির্দেশ দেন। নবী বংশধর এক সাইয়্যেদা রমণীকে প্রথমে বিবাহ করেন। এভাবে তিনি সর্বমোট চারটি বিবাহ করেন। আল্লাহ পাক তাঁর ঘরে বিশ জন ছেলে এবং উনত্রিশ কন্যাসন্তান সন্তান দান করেন।

সত্যবাদিতা

হযরত বড়পীর সব সময় সত্যের সাথে ও হকের সাথে থাকতেন। তিনি আপন প্রাণপণে সত্য বলেছেন। তিনি শাসন-কর্তাদের মন্দ কাজ-কর্ম সম্পর্কে বলতেও দ্বিধা-বোধ করতেন না। তিনি মসজিদের মেহরাবে দাঁড়িয়ে উম্মুক্ত কণ্ঠে ওয়াজ-নসীহত করতেন।

একদা তৎকালীন খলীফা/শাসনকর্তা আল মোক্বতাযী লি আমরিল্লাহ্ বাগদাদ নগরীর কাযী (বিচারক) হিসেবে 'ইয়াহইয়া ইবনে সা'ঈদ' নামক এক ব্যক্তিকে নিয়োগ প্রদান করেন। আর কাযী ইয়াহইয়া ইবনে সা'ঈদ ছিল একজন অত্যাচারী লোক। মানুষ তার অত্যাচারে অতীষ্ঠ হচ্ছিল, কিন্তু কেউ ভয়ে কিছু বলতে সাহস করছিল না। বড়পীর একথা জানার পর খলীফা আল মোক্বতাযী লি আমরিল্লাহ্কে সম্বোধন করে তার উপস্থিতিতে বললেন, "তুমি একজন যালিম (অত্যাচারী)কে কাযীর আসনে বসিয়েছ। আল্লাহর নিকট কি জবাব দেবে?" খলীফা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে কাঁদতে লাগলেন, আর যালিম ইয়াহইয়া ইবনে সা'ঈদকে সাথে সাথে বরখাস্ত করলেন।

মেহমানদারী

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে জিজ্ঞাসা করলেন, ইসলামের মধ্যে কোন্ কাজটি উত্তম? নবী করীম বললেন, "পরিচিত ও অপরিচত লোকদের খাদ্য খাওয়ানো ও সালাম দেয়া।"

জগতে যত বিখ্যাত ওলী-বুযুর্গ রয়েছেন, সকলে মেহমানদারী ও দান-সদক্বায় বেশি মনযোগী ছিলেন। হযরত বড়পীর সব সময় দান-সদক্বা এবং মেহমানদারীতে যত্নশীল ছিলেন। তাঁর দরবারে অনেক মেহমান আগমন

করতেন। আর তৎকালীন রাজা-বাদশাহ সহ সকলে হাদিয়াও হযরত বড়পীর এর দরবারে প্রেরণ করতেন। তিনি হাদিয়া স্পর্শ করতেন না। মানুষের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন। প্রায়শ তিনি মেহমানদের সাথে আহার করতেন।

ধনী-গরীবদের সাথে আচরণ

হযরত বড়পীরের ধন-সম্পদের প্রতি মোটেও লোভ ছিল না। সর্বদা গরীব লোকদের সাথে থাকতে পছন্দ করতেন; কারণ নবীজী সব সময় এ দোয়া করতেন "হে আল্লাহ! আমাকে গরীব-মিসকীনরূপে জীবিত রাখো, মিসকীনরূপে আমার ওফাত দাও এবং মিসকীনদের দলে আমার হাশর করো।" ধনীরা তাঁর দরবারে আসলে তিনি তাদের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতেন না। ধনীরা হাদিয়া প্রদান করলে তিনি তা গ্রহণে বিরক্ত হতেন। যুগের বাদশাহ-কাজীরা তার দরবারে আসলে তিনি তাদের সম্মানে দাঁড়াতেন না। তিনি তাদের আগমনের পূর্বে মজলিস থেকে উঠে ঘরের ভিতরে চলে যেতেন। তারপর এসে দাঁড়ানো অবস্থায় তাঁদের সাথে সাক্ষাৎ করতেন। তিনি বাদশাহদের প্রয়োজনীয় উপদেশ দিতেন।

একবার হজ্জ পালন কারার জন্য তিনি কাফেলা নিয়ে মক্কা ও মদীনা শরীফের দিকে রওনা করলেন। রাস্তায় একদিন রাত হয়ে যাচ্ছে, বড়পীর সাথীদেরকে নির্দেশ দিলেন, কোন দরিদ্র বা গরীবের বাড়ী তালাশ করো; আজ যেই বাড়ীতে রাত্রি যাপন করব। সকলে মিলে একটি বাড়ী পেল, যে বাড়ীতে মাত্র তিনজন সদস্য রয়েছে। সকলে গরীব লোকটির বাড়ীতে গেলেন, বড়পীর বললেন, "আজ রাত তোমার বাড়ীতে থাকতে চাই।" বাড়ীর মালিক বড়পীরকে চিনে; লোকটা বললেন, "হুজুর আপনাদের আপ্যায়নের ক্ষমতা আমার নেই।" বড়পীর বললেন, "আমার তোমার খেদমতের কিংবা আতিথ্যের প্রয়োজন নেই"। তারপর সেই বাড়ীতে সকলে থাকার জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা করা হল। মুহূর্তের মধ্যে সারা এলাকায় খবর ছড়িয়ে গেল, বড়পীর আমাদের এলাকায়, জনৈক গরীব লোকের বাড়ীতে! সমাজের ধনী, গণ্য-মান্য ব্যক্তিরা সকলে বড়পীরের খেদমতে হাজির হয়ে গেলেন। প্রত্যেকে বললেন, "হুজুর আমার বাড়ীতে আসুন।" বড়পীর সকলের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। নিরুপায় হয়ে সকলে বিভিন্ন হাদিয়া, নজর-নিয়াজ, খাদ্য সামগ্রী, টাকা-পয়সা ইত্যাদি দিতে লাগল। বড়পীর কারো হাদিয়া নিজের জন্য গ্রহণ করলেন না। পরে বাড়ীর মালিক দরিদ্র

লোকটিকে সব কিছু দিয়ে সকাল বেলা বড়পীর সাথীদেরকে নিয়ে বিদায় নিলেন। হুযূর গাউসে পাকের বরকত, দো'আ ওই দানের ফলে লোকটি সমৃদ্ধ হয়ে গেলো।

মতাদর্শ

আমরা সকলে একটি হাদীস শরীফ জানি, প্রিয় নবীজী ইরশাদ করেন, "আমার উম্মতের মধ্যে ৭৩ দল হবে, ৭২ দল দোযখী এবং ১টি দল হবে জান্নাতী, তা হল "আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত"। বাকি দলগুলো নানা রকম ভ্রান্ত আক্বীদা বা ধর্মবিশ্বাস ও কাজের কারণে সঠিক দল থেকে ছুটে যাবে এবং দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে।

মত ও আদর্শ দু'টি শব্দ সন্ধির মাধ্যমে 'মতাদর্শ' হয়েছে। আর এর অর্থ হল তিনি কোন্ মত বা আদর্শে বিশ্বাসী? বড়পীর হযরত আব্দুল ক্বাদের জীলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন "আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত"-এর অনুসারী এবং একজন সফল ইমাম ও প্রচারক। তিনি সর্বদা এ মতের পক্ষে কথা বলতেন। তিনি হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন।

ওয়াজ ও বয়ান

গাউসুল আযম আব্দুল ক্বাদের জীলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নানা স্থানে নানা সময়ে ওয়াজ ও নসীহত করতেন। তিনি সময়োচিৎ ওয়াজ করতেন। যেমন বিধর্মীদেরকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিতেন। তাছাড়া মানুষকে সৎ চরিত্র, বিশ্বাস, ইলমে শরীয়ত, তাক্বওয়ার মত নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তিনি উপদেশ দিতেন।

হযরত বড়পীরের ওয়াজের প্রধান ও অন্যতম বিষয়বস্তু ছিল- সূফীবাদ তথা আল্লাহকে ভয় করা, সর্বদা জিকির-আসকার করা নিয়ে। তাওবা, এনাবত, যুহদ, ওয়ার, শোকর, সবর, তাসলীম, রিদা, তাওয়াক্কুল ও কানাআতের মত উত্তম গুণাবলীকে গ্রহণ করার জন্য আহবান জানাতেন। অপর দিকে কৃপণতা, অহংকার, হিংসা, ক্রোধ, মিথ্যা, গীবত, হারাম, শত্রুতা এমন মন্দ গুণাবলী থেকে বিরত থাকারও আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর ওয়াজ মাহফিলে সামনের প্রচুর লোকের সমাগম হতো কিন্তু পেছনের শ্রোতারাও তাঁর সামনের শ্রোতাদের মতো শুনতে পেতো।

বায়'আত গ্রহণ

বহুকাল বনে জঙ্গলে একাকী কাটানোর পর আত্মার আরো উন্নতির লক্ষ্যে নেযামিয়া মাদ্‌রাসার অধ্যাপক কালজয়ী বুযুর্গ হযরত আবূ সা'ঈদ মাখযূমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর নিকট হযরত বড়পীর বায়'আত গ্রহণ করার মাধ্যমে মুরিদ হন। বড়পীর অল্পদিনে তরীক্বতের উচ্চ আসনে আসীন হন, যার কারণে আপন পীর তাকে খেলাফত প্রদান করেন।

ইবাদত-বন্দেগী

আল্লাহ তা'আলা বলেন- "নিশ্চয় নামায মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে"। নবীজী ইরশাদ করেন- "নামায মুমিনের জন্য মিরাজ"। নবীজী আরো এরশাদ করেন- "ইসলাম পাঁচটি খুঁটির উপর দাঁড়ানো, তা হল- ১.ঈমান, ২.নামায, ৩. যাকাত, ৪. হজ্জ, ৫. রোযা।"

হযরত গাউসুল আযম আব্দুল ক্বাদের জীলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন একজন উচ্চস্তরের ইবাদতকারী। তাঁর ইবাদত-বন্দেগীর পরিমাপ করা অসম্ভব। তিনি জীবনের বেশী সময়ই আল্লাহর ইবাদত তথা নামায, দুরুদ শরীফ আর ইলমে দ্বীন চর্চায় কাটিয়েছেন।

তিনি দীর্ঘ ২৮ বছর দৈনিক একবার এক পায়ের উপর দাঁড়িয়ে পবিত্র ক্বোরআন শরীফ খতম করেছেন। আর দীর্ঘ ৪০ বছর এশার নামাযের ওযু দিয়ে ফজরের নামায আদায় করেছেন। তিনি রাতে নিদ্রা যেতেন না; নফল নামায আদায় করতেন, জিকির-আযকার করতেন আর দুরুদ শরীফ পাঠ করতেন।

ফজরের নামায আদায় করে তিনি কোরআন শরীফ তিলওয়াত করতেন এবং জিকির-আযকার, ওযীফা ও দোয়া কালাম পাঠ করতেন। তিনি সকালে সূর্য উঠার পর ইশরাক, চাশতের নামায পড়তেন।

মাতৃগর্ভে আঠার পারা ক্বোরআন হেফয করা

প্রিয় সাথীরা! আল-ক্বোরআন আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য পাঠিয়েছেন। আমরা অনেকে ক্বোরআন পড়তে জানি; কিন্তু শহরের কিছু ছোট্ট বন্ধু এমন আছে, যারা ক্বোরআন কোন দিন তো দেখেই নি; পড়বে কোথা থেকে। ক্বোরআন আমাদের সংবিধান, তাই আমাদের ক্বোরআন শিখতে হবে, জানতে

হবে, মানতেও হবে। দুনিয়াতে শান্তি আর পরকালে মুক্তির বাণীই ক্বোরআনে রয়েছে।

গাউসে পাকের মাতা সাইয়্যেদা উম্মুল খায়ের আমাতুল জব্বার ফাতিমা রাহমাতুল্লাহি আলাইহা ছিলেন পবিত্র ক্বোরআর শরীফের ১৮ পারার হাফেজা। অধিক্যাংশ সময় তিনি তা পাঠ করতেন। বড়পীর ছিলেন মাতৃগর্ভের ওলী। তিনি জাগ্রত অবস্থায় সর্বদা ক্বোরআন তিলাওয়াত শুনতেন। এভাবে তিনি ১৮ পারা মাতৃগর্ভেই মুখস্থ করেছিলেন। বাল্য বয়সে মক্তবে যখন গেলেন উস্তাদ যখন বলেন, পড় "বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম"। বড়পীর বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম পড়ে ১৮ পারা পর্যন্ত একটানা শুনিয়ে ছিলেন। পরে নিজের চেষ্টায় পুরা ক্বোরআন শরীফের তিনি হাফেজ হন।

গ্রন্থাবলী

হুযূর গাউসে পাক অতি উচ্চমানের লেখক ছিলেন। তাঁর নিম্নলিখিত-

১. তাফসীরে জিলানী
২. গুনিয়াতুত তালেবীন
৩. হিজবুল বাশায়েরিল খায়রাত
৪. দিওয়ানে গাউসুল আযম
৫. আল-ফুতুহাতুর রহমানিয়াহ
৬. সিররুল আসরার
৭. ফুতহুল গায়েব
৮. আল-ফতহুর রাব্বানী
৯. কাসিদায়ে গাউসিয়া এবং ১০. মাকতুবাতে গাউসিয়া

যুগের সেরা মুফতী

মুসলমানগণ তাদের জীবন পরিচালনা করার জন্য কোন বিষয়ে সমস্যায় পড়ে গেলে শরীয়তের চার দলীলের (ক্বোরআন, হাদীস, ইজমা', ক্বিয়াস) ভিত্তিতে যে সমাধান দেয়া হয়, তাকে 'ফাতওয়া' বলে। যিনি ফাতওয়া প্রদান করেন তাকে মুফতী বা ফক্বীহ বলে।

জ্ঞানে, আমলে, চরিত্রে যেমনি হযরত আব্দুল ক্বাদের জীলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রথম কাতারের মহাপুরুষ; তেমনি যুগ শ্রেষ্ঠ মুফতীও ছিলেন তিনি। দেশ-বিদেশের অনেক মানুষ, আলেম, বুযুর্গ তার কাছ থেকে ফাতওয়া নেয়ার জন্য আসতেন। তিনি ৩৩ বছর ফাতওয়া প্রদানের মাধ্যমে মানুষের সেবা করেছেন। তিনি ফাতওয়া প্রদানের ক্ষেত্রে ফাতওয়া তলবকারী যে মাযহাব অনুসরণ করতেন, তিনি সেই মাযহাব মোতাবেক ফাতওয়া প্রদান করতেন।

খাজা মুঈন উদ্দীন চিশতীর বাগদাদ আগমন

কথায় আছে- "রতনে রতন চিনে।" তৎকালীন যুগের শ্রেষ্ঠ অলী ছিলেন, হযরত আব্দুল ক্বাদের জীলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। আর তাঁর সঙ্গ বা সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য সাধারণ মানুষতো আসতোই বড় বড় ওলী-আওলিয়াও আসতেন। চিশতীয়া তরীক্বার শ্রেষ্ঠপুরুষ হলেন হযরত খাজা মুঈন উদ্দীন চিশতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

একদা খাজা মুঈন উদ্দীন চিশতী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি ১৩ বছর বয়সী আপন মুরিদ নিয়ে হযরত আব্দুল ক্বাদের জীলানী এর দরবারে হাজির হলেন। বড়পীর বললেন, "হে মুঈন উদ্দীন, তোমার সাথে কে?" খাজা সাহেব বললেন, "সে আমার মুরিদ, তার নাম কুতুব উদ্দীন; ছোটবেলায় সে আমার কাছে মুরিদ হয়।" বড়পীর খুশি হয়ে কুতুব উদ্দীন-এর মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। বললেন, "সে যমানার সেরা বড় একজন ওলী হবে।" কার্যত কুতুব উদ্দীন বখতিয়ার কাকী নামে তিনি মুসলিম জাহানে পরিচিত; যার মাযার ভারতের রাজধানী দিল্লীতে অবস্থিত।

ক্বাদেরিয়া তরীক্বা প্রতিষ্ঠাতা

ক্বাদেরিয়া তরীক্বার প্রতিষ্ঠাতা হলেন বড়পীর গাউসুল আযম আব্দুল ক্বাদের জীলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। আর তাঁরই নামানুসারে "ক্বাদেরিয়া তরীক্বা" নামকরণ করা হয়। পৃথিবীতে এ পর্যন্ত ৩১৩ টি সঠিক তরীক্বার সন্ধান পাওয়া গেছে। আর বিশ্বের তরীক্বত বা তাসাউফ পন্থীদের ৮০ ভাগ চর্চা করেন ক্বাদেরিয়া তরীক্বা অনুযায়ী। এ ছাড়াও চিশতীয়া, নকশেবন্দীয়া, মোজাদ্দেদীয়া তরীক্বার অনুসারী বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রয়েছে।

সমাজ সংস্কার

প্রিয় নবী ইরশাদ করেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা এই উম্মদের মধ্য হতে প্রতি শতকের শুরুতে এমন একজন ব্যক্তিকে প্রেরণ করবেন, যিনি এ দ্বীনকে নতুন ভাবে সংস্কার করবেন।" ধর্মের মধ্যে যখন মানুষের অজ্ঞতার কারণে অধার্মিকতা যুক্ত হয়, তখনই সংস্কারক এ কাজ গুলোকে প্রতিহত করেন। দ্বীনকে আবার নবীজীর আমলের রূপ দান করবেন।

গাউসুল আযম হযরত সাইয়্যেদ আব্দুল ক্বাদের জীলানী ছিলেন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ৬ষ্ঠ শতাব্দীর সমাজ সংস্কারক বা মুজাদ্দিদ। তিনি তৎকালীন সময়ে অনেক সংস্কার করেছিলেন। তাকে তৎকালীন আলেম-ওলামাগণ বিনা আপত্তিতে মুজাদ্দিদ হিসেবে মেনে নিয়েছিলেন।

একদিন বড়পীর রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। রাস্তার পাশে এক বৃদ্ধ জড়াজীর্ণ ও অসহায় অবস্থায় গাউসে পাককে বললো, "হে শায়খ আবদুল ক্বাদির! আমাকে সাহায্য কর, আমি অসহায়, আমি চলা-ফেরা করতে পারি না, আমার শক্তি শেষ হয়ে গেছে।" আর বড়পীর গাউসুল আযম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বৃদ্ধকে সাহায্যের জন্য স্পর্শ করতেই সে এক জ্যোতির্ময় শরীর নিয়ে উঠে বসল। মনে হলো, সে সম্পূর্ণ সুস্থ। বড়পীর অশ্চর্যান্বিত হলেন। লোকটি বলল, হুযূর, আমি হলাম, 'ইসলাম'। আপনি আমাকে যে অবস্থায় দেখেছেন তা হচ্ছে ইসলামের অবস্থা। আপনার মাধ্যমে নবীর রেখে যাওয়া ইসলাম পুনরায় জীবিত হবে। এর পর থেকে বড়পীর 'মহিউদ্দীন' অর্থাৎ দ্বীন-ইসলামকে জিন্দাকারী উপাধি লাভ করেন।

উপদেশ

অনেক সাধারণ মানুষ সহ সমাজের সম্মানিত ব্যক্তিরা গাউসুল আযম হযরত বড়পীর-এর দরবারে উপদেশ শুনার জন্য আসতেন। মোত্তাক্বী তথা ঈমানদার-মুসলমানদের জন্য তিনি অনেক উপদেশ প্রদান করেছেন; যা তাদের ইহকালীন ও পরকালীন জীবনে কল্যাণ আনয়ন করেছে। নিম্নে এক সময়ে দেয়া ১০টি উপদেশ উপস্থাপন করা হল–

১. প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য যাবতীয় গুনাহ বর্জন কর ও নিজের শরীরকে হেফাজত কর। আর তা করতে পারলে, অতি তাড়াতাড়ি তুমি এর উত্তম ফলাফল পাবে।

২. নিজের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য, টাকা-পয়সার দায়িত্ব অন্যের উপর ন্যস্ত করো না, এটা আল্লাহর দায়িত্ব। তুমি সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কজের নিষেধ করবে, এতে অনেক সম্মান রয়েছে।

৩. মানুষের নিকট কিছু পাওয়া আশা থেকে বিরত থাক। কেননা এর দ্বারা সম্মান, মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব নষ্ট হয়। আর অন্যের প্রতি আশা করার কারণে অনর্থক কাজ, কথা, চিন্তা-ভাবনা হতে মুক্তি পাওয়া যায় না।

৪. কোন নির্দিষ্ট মুসলমানকে মুনাফিক বা কাফির বলবে না; এটা সুন্নাত তরীক্বা। কে মুনাফিক, মুশরিক, কাফির তা আল্লাহ্ই ভালো জানে।

৫. কাউকে বদদোআ বা মন্দ কামনা কর না। ধৈর্য ও সংযমের সাথে সকল অবিচার, দুঃখ, কষ্ট সহ্য কর। আর এ কারণে মানুষ তোমাকে ভালবাসবে এবং শ্রদ্ধা করবে।

৬. বিনয়, আদব, নম্রতা, শিষ্টাচারের মধ্যেই ধর্মভীরুতা ও সর্বাধিক মর্যাদা নিহিত আছে এবং যাবতীয় ইবাদতের সাথে যুক্ত আছে; এগুলো অবলম্বন কর। কেননা স্বভাব-চরিত্রের মাধ্যমেই ভাল মানুষ হওয়া যায়।

৭. আর কাউকে অভিশাপ করো না। সত্যপরায়ণ ও পুণ্যবান লোকের এটা কাজ। আর তবেই আল্লাহ পাক তোমায় সমুন্নত ও অক্ষুণ্ন রাখবেন। আর অন্যের অনিষ্ট থেকে মুক্ত রাখবেন।

৮. মিথ্যা বর্জন কর। হাসি-তামাশা, ঠাট্টা-বিদ্রুপ ও কৌতুক বশতও মিথ্যা কথা বল না। যদি সত্য কথা বলার অভ্যাস করতে পারো, তবে আল্লাহ তোমায় রুহানী (আধ্যাত্মিক) দৃষ্টিশক্তি এবং জ্ঞান দান করবেন।

৯. আল্লাহর নামে শপথ কর না। হুশিয়ার আল্লাহর নামের শপথ যেন তোমার মুখে উচ্চারিত না হয় (কেননা আমাদের সমাজে অযথা অহেতুক "আল্লাহ"র নামে শপথ করে ভঙ্গ করতে দেখা যায়)। এভাবে চরিত্র গঠন করতে পারলে তোমার ভেতরে আল্লাহর নূরের জ্যোতি প্রবিষ্ট হবে। তুমি উচ্চ মর্যাদায় আসীন হবে।

১০. কুপথ ও প্রতিজ্ঞা করা থেকে বেঁচে থাক। এটাতে তোমার বদান্যতা ও লজ্জাশীলতার শ্রেষ্ঠ মর্যাদা দান করা হবে।

ইন্তিক্বাল

আল্লাহ তা'আলা বলেন, "সকল প্রাণী মরণশীল"। তিনি আরো বলেন, "যখন মৃত্যু আসবে, তখন কারো জন্য এক মুহূর্তও অপেক্ষা করা হবে না"। পবিত্র ক্বোরআনে আরো এসেছে- "প্রত্যেক প্রাণকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে এবং আমি তোমাদের পরীক্ষা করি মন্দ ও ভাল পার্থক্য করার জন্য এবং আমার প্রতি তোমাদেরকে ফিরে আসতে হবে।" যে প্রাণী জন্ম গ্রহণ করেছে, সে প্রাণী মৃত্যু বরণ করতেই হবে। কবি বলেন, 'এমন জীবন করিবে গঠন, মরনে হাসিবে তুমি, কাঁদিবে ভুবন'।

আর ইন্তিকালের পূর্বে বড়পীর বলেছেন- আমাকে গোসল করিয়ে দাও, বড়পুত্র আব্দুল ওহহাব গোসল করিয়ে দিলেন। অত্যন্ত আবেগ ও দীর্ঘ সময় নিয়ে এশার নামায আদায় করলেন। নামায শেষ করে দোয়া করতে লাগলেন- হে করুণাময় আল্লাহ! আপনি উম্মতে মুহাম্মদীকে মাফ করে দিন, তাদের উপর রহমত নাজিল করুন, তাদের গুনাহরাশি ক্ষমা করুন।

ইসলামের এ অন্যতম মহান কান্ডারী তাঁর বিশাল কর্মময় জীবন ও আদর্শ রেখে ১১ রবিউস সানী ৫৬১ হিজরী মোতাবেক ১১৬৬ ঈসায়ী সনের সোমবার, ইশার নামাযের পর ৯১ বছর বয়সে আল্লাহ তা'আলার দিদারে চলে যান (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন) রেখে যান কোটি কোটি ভক্ত আর অনুসারী।

মাযার শরীফ

মুহূর্তের মধ্যে গাউসুল আ'যম আব্দুল কাদের জীলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর ইন্তেকালের খবর ছড়িয়ে পড়ে। আর মানুষ শুনা মাত্র এক নযর দেখার জন্য হযরত বড়পীরের বাড়ীতে ভিড় জমাতে শুরু করে। লোকে লোকারণ্য; তিল ধারণের স্থান নেই। শোকে কেউ দিশেহারা হয়ে গেল, আবার কেউ কেউ শোকে পাথর হয়ে গেল। বড়পীরের বড় ছেলে শায়খ আব্দুল ওয়াহাব আপন পিতাকে কাফন পড়ালেন। লক্ষ লক্ষ মানুষ ও জিন ভক্তের সামনে গভীর রাতে আপন মাদরাসায়ে ক্বাদেরিয়ার বারান্দায় দাফন করা হয়। যা বর্তমানে ইরাকের বাগদাদ শহরে অবস্থিত। প্রতি বছর ১১ রবিউস সানী গাউসুল আ'যম আব্দুল ক্বাদের জীলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর ওফাত বা মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে মাযারে তাঁর ওরস পালন করা হয়। দেশ-বিদেশ থেকে বহু আশেক ভক্ত উক্ত উরশে যোগদান করেন। দো'আ করেন বিশ্ব শান্তির জন্য, পরিবার-পরিজনের জন্য। এ

দুনিয়াতে ভাল থাকার জন্য এবং পরকালের শান্তির জন্য। গোটা দুনিয়ায় মুসলমানগণ ফাতিহা-ই এয়াজদাহুম তথা হুযূর গাউসে পাকের ওরস শরীফ, আলোচনা ও ওয়াজ মাহফিলে তাঁকে স্মরণ করে থাকেন।

কারামত

ছোট্ট সাথীরা! আগে আমাদেরকে কারামত কি তা জানতে হবে। আল্লাহ তা'আলার ওলী তথা প্রিয়ভাজনদের নিকট থেকে যে অস্বাভাবিক ও অলৌকিক কর্মকান্ড প্রকাশিত হয় তাকে 'কারামাত' বলে। "ওলীগণের কারামত সত্য।" ওলীগণ নিজেদের শক্তির মাধ্যমে নয়; বরং আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতার মাধ্যমে কারামত প্রকাশিত করেন। হযরত বড়পীর একাধারে উচ্চমাপের আলেম, আবেদ ও আল্লাহর ওলী ছিলেন। আর বড়পীরের কাছ থেকে নানা সময়ে নানা রকম অগণিত কারামাত প্রকাশ পেয়েছিল। কিছু কিছু দুনিয়ায় আসার পূর্বে, আবার কিছু কিছু পরে সংগঠিত হয়েছে। কয়েকটি উপস্থাপন করা হল-

১. **ভন্ড ফকির থেকে মাকে রক্ষা করা:** গাউসে পাক যখন মায়ের পেটে, তখন এক ভিক্ষুক ভিক্ষার জন্য বাড়িতে আসল। পিতা আবূ সালেহ মূসা বাড়িতে নেই। ভিক্ষুক বার বার ডাকছে সাহায্য কর, সাহায্য কর। গাউসে পাকের মাতা পর্দাশীলা। ভিক্ষুকের ডাকাডাকির কারণে তার দিল নরম হয়ে গেল। তিনি পর্দার আড়াল থেকে ভিক্ষা দিলেন। ভিক্ষকের চরিত্র ছিল খারাপ; সে বুঝতে পারলো বাড়িতে আর কেউ নেই। ভিক্ষুক ঘরে প্রবেশ করার জন্য উদ্যত হলে গাউসে পাকের আম্মাজান টের পেয়ে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলেন। সাথে সাথে দোয়া কবুল হলো। একটি বাঘ এসে গর্জন দিয়ে ভিক্ষুকের ঘাড়ের উপর লাফিয়ে পড়ল। তার ঘাড় ভেঙ্গে দিয়ে হঠাৎ বাঘটি অদৃশ্য হয়ে গেল। বড়পীর একদিন প্রসঙ্গক্রমে আম্মাজানকে বললেন, "মা আমি দুনিয়া আগমনের পূর্বে আপনার ইজ্জত রক্ষা করেছি। তখন বাঘ হয়ে আমিই এসেছিলাম"।

২. **আলেমগণকে উত্তর প্রদান:** বাগদাদের কিছু আলেম হযরত আব্দুল ক্বাদির জীলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর খ্যাতি শুনে হিংসায় ফেটে পড়ে। তারা ১০০ আলেম বিভিন্ন জটিল প্রশ্ন নিয়ে গাউসে পাকের কাছে গেলেন। গাউসে পাক তাদেরকে বসতে জায়গা দিলেন। তারপর তিনি একটু মোরাক্বাবা (ধ্যান) করলেন। হঠাৎ গাউসে পাকের বুক থেকে একটি নূরের

ঝলক বের হয়ে আলেমদের উপর পড়ল সাথে সাথে ওই আলেমগণ বুঝতে পারলেন যে, তাদের সমস্ত ইল্‌ম উধাও হয়ে গেছে। সুতরাং তারা দিশেহারা হয়ে নিজেদের কাপড়-চোপড় ছিঁড়ে পাগলের মত ছুটাছুটি করতে লাগল। অতঃপর হযরত গাউসে পাক তাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তাদেরকে ফিরিয়ে দিলেন। আর তাঁরাও গাউসে পাকের অনুগত হয়ে গেলেন। অবশ্য, তিনি তাঁদের সমস্ত প্রশ্নের জবাবও দিয়েদিলেন। ফলে তারা গাউসে পাকের অসাধারণ জ্ঞানের বিষয়টিও মেনে নিলেন।

৩. **চোরকে আবদাল বানানো:** একদিন এক চোর হযরত বড়পীরের ঘরে চুরি করার জন্য প্রবেশ করল। বড়পীর বুঝতে পারলেন ঘরে চোর প্রবেশ করেছে। তিনি আল্লাহর রহমতে, তাঁর বেলায়তী শক্তির মাধ্যমে চোরকে ঘরে আবদ্ধ করে ফেলেন। আর চোরের চোখ অন্ধ হয়ে যায়। চোর নিরূপায় ঘরের এককোণে চোর অবস্থান নিল। অন্যদিকে সকাল বেলায় ফজরের নামাযের পর হযরত খাদ্বির আলায়হিস্ সালাম এসে এক এলাকার জন্য আবদাল চাইলেন। কারণ ওই এলাকার আবদালের ইনতিকাল হয়েছিলো। তখন গাউসে পাক খাদিমকে পাঠিয়ে চোরটাকে হাযির করলেন এবং তাঁর বেলায়তী দৃষ্টি দিয়ে তাকে মুহূর্তে আবদাল বানিয়ে দিলেন।

৪. **ভুনা ডিম মুরগির বাচ্চা হয়ে যাওয়া:** একবার হযরত বড়পীর বাজারের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন। আর বাজারের হোটেলে ডিম ভাজি/ভুনা করে উপস্থাপন করে রাখা হয়েছে। বাবুর্চি আরো কতগুলি ডিম ভুনা করার উদ্দেশ্যে কাজ করছেন। হযরত বড়পীর মনে মনে আক্ষেপ করে ভাবতে লাগলেন ও বলতে লাগলেন- "হায়! ডিমগুলি ভুনা না করলে, এক একটি ডিম থেকে এক একটি বাচ্চা জন্ম নিত, বাচ্চারা আনন্দে খেলা করত" হযরত বড়পীর মনে মনে এ কল্পনা শেষ না হতেই ভুনা ডিমগুলি মুরগির বাচ্চা হয়ে উড়ে যেতে লাগল।

৫. **বাদশাহকে উচিত শিক্ষা প্রদান :** একদা বাগদাদের বাদশাহ "মুসতানজিদ বিল্লাহ্" গাউসে পাকের দরবারে উপস্থিত হয়ে সালাম করলেন এবং কিছু উপদেশ প্রদান করার জন্য আবেদন করলেন। আর বাদশাহ বড়পীরের সামনে অনেক থলে ভর্তি হাদিয়া পেশ করলেন। বড়পীর বললেন, "আমার এগুলোর প্রয়োজন নেই।" বাদশাহ নিজের আশা ব্যর্থ হওয়া কিংবা মান-সম্মানের ক্ষতি হবে ভেবে হাদিয়াগুলো গ্রহণ করার জন্য গাউসে পাকের খিদমতে অনুরোধ করতে লাগলেন। তখন হযরত গাউসে

পাক তাঁর হাতে হাদিয়ার একটা থলে নিলেন এবং চাপ দিলেন। উভয় থলে থেকে তাজা তাজা রক্ত বের হতে লাগল। গাউসে পাক বললেন, হে দুনিয়াবী বাদশাহ! তুমি আল্লাহকে ভয় কর! মানুষের রক্ত চুষে খাচ্ছ আর আমার জন্য হাদিয়া এনেছ? একথা শুনে বাদশাহ অজ্ঞান হয়ে গেলেন।

৬. **জড় পদার্থের আনুগত্য :** বাগদাদ নগরীর জনৈক খলীফা বড়পীর আব্দুল ক্বাদের জীলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর দরবারে হাজির হয়ে আবেদন করলেন যে, আপনার যেকোন একটি কারামাত দেখতে চাই, যার মাধ্যমে আমি অন্তরে শান্তি পাব। গাউসে পাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন, "হে খলীফা, তুমি কি চাও বা তোমার কি প্রয়োজন?" খলীফা বললেন, "আমি অদৃশ্য থেকে আপেল চাই। আর ফলটি তৎকালীন সময়ে ইরাকের কোথাও ছিলো না। বড়পীর বাতাসে হাত দিলেন কুদরতী ভাবে তাঁর হাতে দু'টি আপেল চলে আসল। বড়পীর খলীফাকে একটি দিলেন ও নিজের হাতে একটি রাখলেন। বড়পীর হাতের ফলটি কেটে দেখলেন সুগন্ধিযুক্ত, সুস্বাদু ও তরু-তাজা। অন্যদিকে খলীফার হাতের ফলটি কেটে দেখল সেটাতে পোকা আর পোকা। খলীফা বড়পীরকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। বড়পীর গাউসে পাক আব্দুল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন, "তোমার ফলে যুলুমের হাত লাগার কারণে ফলে পোকা পড়েছে। গাউসে পাক নির্ভয়ে খলীফাকে তাঁর ত্রুটির কথা বলে দিলেন। হুযূর গাউসে পাকের কারামত অসংখ্য। এখানে এর কয়েকটা মাত্র উল্লেখ করলাম। তাঁর অন্যান্য জীবনী গ্রন্থে আরো বহু কারামত লিপিবদ্ধ হয়েছে। 'বাহজাতুল আসরার' নামক গ্রন্থটি এ বিষয়ে একটি অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য। জনাব মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান সেটার সরল ভাষায় বঙ্গানুবাদ করেছেন। তাও এখন সুলভে পাওয়া যাচ্ছে। সেটা সংগ্রহ করে পাঠ করতে পারো।

বড়পীর নিয়ে গবেষণা

বড়পীর হযরত আব্দুল ক্বাদের জীলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর জীবন ধারা একজন সাধারণ মুসলমানের মতো নয়; বরং ভিন্নতার কারণে বড়পীরের আদর্শ, সাধনা, কর্ম, সমাজ সংস্কার, জীবনী সহ জীবনের সংশ্লিষ্ট নানা বিষয় নিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা চলছে। অনেক গবেষক গবেষণায় ডক্টরেট ডিগ্রীও লাভ করেছেন।

বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়েও বড়পীর নিয়ে গবেষণা হয়েছে। বর্তমানে বড়পীরের জীবনী নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পি.এইচ.ডি. গবেষণা চলছে।

বিশেষ করে ভারত, পাকিস্তান, ইরাক, ইরানে বড়পীর নিয়ে অনেক গবেষণা হচ্ছে।

বাংলাদেশে বড়পীরের চর্চা

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশে হযরত বড়পীর আব্দুল ক্বাদের জীলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর চর্চা যথেষ্ট হচ্ছে। কাদেরিয়া তরীক্বার অনুসারীরা প্রতি আরবি মাসের ১১ তারিখে গেয়ারভী শরীফ বা বড়পীরের স্মরণে বিশেষ ওয়ায মাহফিল করে থাকেন। তা ছাড়াও বড়পীরের নামানুসারে "খতমে গাউসিয়া শরীফ" আমাদের দেশে বেশ জনপ্রিয়।

রবিউস সানী/রবিউল আখির মাসের ১১ তারিখে 'ফাতিহায়ে ইয়াজদাহুম' পালন করা হয়ে থাকে। ফাতেহা এর ব্যবহারিক অর্থ: ক্বোরআন তেলাওয়াত, দোয়া, ইসালে সাওয়াব ও তাবারুক বিতরণ। আর ১১ কে উর্দুতে গেয়ারাহ্, ফারসিতে ইয়াজদাহুম বলা হয়। হযরত বড়পীর আব্দুল ক্বাদের জীলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর ওফাত বা ইন্তেক্বাল দিবস উপলক্ষে যে বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠান করা হয়, তাই 'ফাতেহা-ই ইয়াজদাহুম।' বিশ্বের অধিকাংশ তরীক্বত পন্থী নিজ নিজ সাধ্যানুসারে এ 'ফাতেহা-ই ইয়াজদাহুম' পালন করে থাকেন।

ব্রিটিশ ও নবাবী আমল থেকেই আমাদের উপমহাদেশে 'ফাতেহা-ই ইয়াজদাহুম' পালিত হযে আসছে। কথিত আছে যে, বাংলাদেশে সর্বপ্রথম এটি চালু করেন হযরত বাবা আদম শহীদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি; যার মাযার বর্তমান সিপাহীপাড়া, মুন্সিগঞ্জ। আর তাঁরই নির্দেশে ১১৭৪ ঈসায়ী সনে অর্থাৎ গাউসে পাকের ৮ম ওফাত বার্ষিক উপলক্ষে প্রধান খলীফা হযরত মুয়া ইবনুল বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আব্দুল্লাহপুর খানকা শরীফে একটি গরু জবাই করে ওরস পালন করেছিলেন।

পূর্বে ঢাকাসহ সারা দেশে সমাজ পরিচালনা করার জন্য প্রত্যেক এলাকায় একটি করে কমিটি ছিল, যাকে বলা হতো পঞ্চায়েত; যারা বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় কাজ-কর্ম পরিচালনা করতেন। 'ফাতেহা-ই ইয়াজদাহুম' সহ ঈদে মিলাদুন্নবী, শবে বরাত, শবে মিরাজ, শবে কদর, আশুরা, মিলাদ মাহফিল খুব জাকজমক সহকারে তাঁরা পালন করতেন। ফাতেহা-ই ইয়াজদাহুম উপলক্ষে তারা আলোকসজ্জা করতেন। সকলে মিলে করুণ সুরে ভালবাসা নিয়ে মীলাদ শরীফ

পাঠ করতেন। মীলাদ শেষে সকলে বরকতময় তাবারুক গ্রহণ করতেন; যা রোগের মহা ঔষধ হিসেবে বিবেচিত। আর এ সকল কাজের ব্যয়ভার সকলে মিলে বহন করতেন।

ব্রিটিশ সরকারের সময়কাল থেকে এ দিবসটি সরকারি ছুটি হিসাবে ঘোষিত হয়ে আসছে। বাংলাদেশে যাতে সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ ফাতেহায়ে ইয়াজদাহাম সুন্দর ভাবে উদযাপন করতে পারে, সেজন্য ১৯৩৯ ঈসায়ী সনে "বাংলার আইন পরিষদ" এ দিনটি সরকারি ছুটির দিন হিসাবে ঘোষণা করে। আজও আমাদের দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহ অনেক সরকারি-আধা সরকারি প্রতিষ্ঠান এ দিবসটিতে ঐচ্ছিক ছুটি ঘোষণা করা হয়।

আমাদের বাংলাদেশে অনেক ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে যারা বড়পীরের বাণী মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে দিতে কাজ করছেন। ক্বাদেরিয়া তরীক্বা চর্চা ও প্রসারে কাজ করছেন। আওলাদে রাসূল বিশ্ব বিখ্যাত পীর সাইয়্যেদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি পাকিস্তান থেকে এদেশে তাশরীফ এনে ১৯৫৪ ঈসায়ী সনে এশিয়া খ্যাত চট্টগ্রামের "জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদরাসা" এবং ক্বাদেরিয়া তরীক্বা প্রতিষ্ঠা ও মসলকে আ'লা হযরতের চর্চা আরম্ভ করেন। রাজধানী ঢাকার "ক্বাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া কামিল মাদরাসা"ও তাঁরই খলিফা ও উত্তরসুরী আওলাদে রাসূল পীরে শরীয়ত ও তরীক্বত সাইয়্যেদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ১৯৬৮ ঈসায়ী সনে প্রতিষ্ঠা করেন।

এশিয়ার অন্যতম ও বৃহৎ দ্বীনি সংস্থা "আন্‌জুমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট"-এর পরিচালনায় বাংলাদেশের প্রায় বিভাগ, জেলা, উপজেলা পর্যায়ে মসজিদ, মাদরাসা, খানকা, এতিমখানা রয়েছে, আর সকল প্রতিষ্ঠানে সর্বদা হযরত বড়পীরের মতাদর্শ প্রচার করছে। বিগত ১৯৮৬ ইংরেজীতে হুযূর কেবলা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ 'গাউসিয়া কমিটি' প্রতিষ্ঠা করে ক্বাদেরিয়া তরীক্বার প্রচার-প্রসারকে আরো জোরদার করেন।

এ ছাড়া বাংলাদেশে অনেক দরবার, মাদরাসা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গবেষণাগার রয়েছে, যারা হযরত বড়পীর আব্দুল ক্বাদের জীলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তথা কাদেরিয়া তরীকার দর্শন বাস্তবায়নে কমবেশী কাজ করছেন।

আমাদের দেশে অনেক ইসলামিক চিন্তাবিদ বড়পীর আব্দুল কাদের জিলানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর জীবনী ও দর্শন এবং সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে বই-পুস্তকও লিখেছেন।

গেয়ারভী শরীফের ফজিলত

হুযূর গাউসে পাকের স্মরণে ও সম্মানে প্রতি আরবি মাসের ১১ তারিখ যে বিশেষ দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়, তাকেই গেয়ারভী শরীফ বলা হয়। বড়পীর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদযাপন উপলক্ষে প্রতি মাসের ১২ তারিখ বারভী শরীফ পালন করতেন। একদিন গাউসে পাক স্বপ্নের মধ্যে নবী পাককে দেখলেন নবীজী গাউসে পাককে উদ্দেশ করে বলেন, "আমার ১২ ই রবিউল আউয়ালকে তুমি যেভাবে সম্মান করে পালন আসছো, আমি এর বিনিময়ে তোমাকে 'গেয়ারভী শরীফ' দান করলাম।"

সে কারণেই তরীক্বত ও তাসাউফপন্থী ভাইয়েরা প্রতি আরবি মাসের ১১ তারিখ অসংখ্য নবী-রাসূল ও বিশেষ করে গাউসুল আযম আব্দুল ক্বাদের জীলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কে স্মরণ করে ওই রাতে বা দিনে গেয়ারভী শরীফ সহ বিভিন্ন শরীয়ত সমর্থিত ভাল কাজ করে থাকেন।

সাধারণ মুসলিম ভাইয়েরা এ দিবসটি উপলক্ষে পবিত্র ক্বোরআন তিলাওয়াত, হামদ-না'ত, জিকির-আযকার, দোয়া-দুরুদ, বয়ান-তাক্বরীর, মিলাদ-ক্বিয়াম, সালাত-সালাম সহ আরো অনেক উত্তম ও নফল কাজ করেন। উন্নত মানের খানা পাকিয়ে ১১ শরীফ উপলক্ষে তা পরিবার-পরিজন, গরিব-দুঃখী, অনাথ-এতিমদের মাঝে বিতরণ করা হয়। যা ইসলামের অন্যতম আদর্শ ও গ্রহণীয় সংস্কৃতি।

পবিত্র গেয়ারভী শরীফ আদায়কারীগণ এর মাধ্যমে অনেক দুনিয়া ও আখিরাতের ফায়দা লাভ করে থাকেন। বিভিন্ন গ্রন্থে এর ফজীলত উল্লেখ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে অভাব দূর হয়। পরিবারে শান্তি নিশ্চিত হয়। বালা-মুসীবত দূর হয়। আল্লাহর ওলগণের সাথে আত্মিক সম্পর্ক সৃষ্টি হয়।

উপসংহার

ছোট্ট বন্ধুরা! তোমরা বড়পীর আব্দুল ক্বাদের জীলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর সম্পর্কে এ ছোট্ট পুস্তিকার মাধ্যমে অনেক কিছু অবগত হলে।

আমাদের সমাজ যেভাবে চলছে, মনে হচ্ছে কিয়ামত অতি নিকটে। হানা-হানি, মারা-মারি, কাটা-কাটি সব জায়গায় কমবেশী চলছেই। এ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হলে আমাদের বড়পীরের জীবনী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে, তাঁর উত্তম উত্তম উপদেশগুলো অনুসারে কাজ করতে হবে।

আজ আমরা কোথায়?

এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই ভাই। একে অপরের ভালোবাসা ও সহযোগিতার হাত বাড়াতে হবে। মহিলাদের জন্য পর্দা ফরজ। পর্দা নারীর সৌন্দর্য ও আভিজাত্য গড়ায়, নিরাপত্তা দেয়। এটা যারা মানতে চায় না তাদেরকে বুঝতে হবে। পবিত্র ক্বোরআন দুনিয়ার সকলের জন্য সংবিধান। ক্বোরআনের শিক্ষাগুলো নিজেরা পালন করে অন্যকে পালন করতে উৎসাহিত করতে হবে। তবেই সমাজে শান্তি ও সমৃদ্ধি বিরাজ করবে। মীলাদ-মাহফিল ও ইসলামী অনুষ্ঠানে আল্লাহ ও রাসূলের কথা, শরীয়তের কথা বলা হয়। প্রায় গান-কন্সার্ট ইত্যাদিতে বিনোদনের নামে অশ্লীলতা প্রদর্শন করা হয়। তাই ইসলামী অনুষ্ঠান মালা প্রচলন করতে হবে সমাজে।

আমরা মুসলমান আর আমাদের দায়িত্ব কি জানতে হবে। মানুষের মত মানুষ হতে হবে। মানুষের কেবল উপকার করতে হবে; ক্ষতি করা যাবে না। এসো জীবনের শুরুর বেলায় নিয়ত করি, "একজন ভাল মানুষ হওয়ার, পিতা-মাতাকে মান্য করি, নিয়মিত নামায পড়ি, মিথ্যা কথা না বলি, বড়দের সম্মান করি, সালাম করি, নিয়মিত স্কুল বা মাদরাসায় যাই, বেশি খেলাধুলা না করি, বেশি বেশি বই পড়ি, ইসলামী সঙ্গীত শিখি, সুন্দর কণ্ঠে শুদ্ধভাবে পবিত্র ক্বোরআন তিলাওয়াত শিখি, অন্য দিকে গান গাওয়া, ছবি আকার মত অনর্থক কাজ না করি।" গাউসে পাক এবং ওলী বুযুর্গদের শৈশবকাল ও জীবনের বাকী অংশে আমাদের জন্য অনেক শিক্ষা রয়েছে। এসো আমরা সেগুলো অনুসরণ করি। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কিরাম ও আওলিয়ায়ে কিরামের পথে ও মতের উপর চলার, বিশেষ করে, হযরত বড়পীর সাইয়্যেদ আব্দুল ক্বাদের জীলানী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি-এর দেখানো বেহেশতী পথে চলার তাওফীক্ব প্রদান করুন। আ-মী-ন।

--সমাপ্ত--